তারিখ : 17 SEP 2017
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

মাছুম বিল্লাহ

শিক্ষা দিবসের তাৎপর্য ও বাস্তবতা

'শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ নয়, শিক্ষা সবার জন্য, জনগণকে শিক্ষিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, শিক্ষা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয়'—বাংলাদেশের সচেতন ছাত্রসমাজ সেই পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকেই সোচ্চার ছিল শিক্ষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। ধাপে ধাপে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে সেই সময় থেকে। এই পরিবর্তনের অনেকটাই সচেতন ছাত্র আন্দোলনের ফসল। কিন্তু আজও সেই স্বপ্ন কি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে? ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ শরিফ শিক্ষা কমিশনের বাণিজ্যমুখিন শিক্ষাব্যবস্থা চালুর সুপারিশের বিরুদ্ধে হরতাল ডেকেছিল। স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের মাত্র দুই মাস পর ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে। আইয়ুব সরকার এই রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করে এবং ১৯৬২ সাল থেকে তা বাস্তবায়ন শুরু করে, যা তৎকালীন ছাত্রসমাজ মেনে নেয়নি।

শরিফ কমিশনের শিক্ষানীতি মূলত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের শিক্ষাকে সংকোচন করার দলিল। এই নীতি কাঠামোতে শিক্ষাকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়, যেমন—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর। পাঁচ বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পাঁচ বছরে, তিন বছরে উচ্চতর ডিগ্রি কোর্স এবং দুই বছরের স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, ছাত্র-শিক্ষকদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রস্তাব করে। শিক্ষকতা একটি সৃজনশীল ও মুক্তমনের পেশা, সেখানে শিক্ষকদের ১৫ ঘণ্টা কাজের বিধান প্রস্তাব করেছিল ওই কমিশন। কমিশন ১৯৬২ সালের ২৬ আগস্টের মধ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন এক প্রতিবেদন প্রেসিডেন্ট বরাবর পেশ করে। পরে ১৯৬২ সালে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনকে নিয়ে একুশ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালন করার মাধ্যমে সরকারের সাম্প্রদায়িক ও বাঙালিবিরোধী মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর এক বৈঠকে ছাত্র ইউনিয়ন সামরিক শাসনের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা, আইয়ুব শিক্ষানীতি বাতিল, রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন শুরুর প্রস্তাব করে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার হলে ৩১ জানুয়ারি চারটি ছাত্রসংগঠন মধুর ক্যান্টিনে যৌথ সভা করে। ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে রাজপথে জঙ্গি মিছিল সামরিক আইন ভঙ্গ করে। ৪ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্র প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের সুসজ্জিত একটি মিছিল নাজিমুদ্দীন রোড দিয়ে পুরান ঢাকায় প্রবেশ করে। এই মিছিলকে প্রতিহত করার জন্য সরকার পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে এবং কার্জন হলের মোড়ে ফিল্ড কামান বসানো হয়। ওই দিন আইয়ুব খানের ছবি পোড়ানো হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর ছাত্ররা হল ত্যাগ করছে না দেখে পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করে ছাত্রদের জোর করে বের করে দেয়। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়েছিল আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। এদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আগেই জারি করা হয়েছিল এবং তা বহুদিন ধরে বহাল ছিল।

শরিফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরে বিশেষত যারা ডিগ্রি পর্যায়ে অধ্যয়ন করছিল তারা কোনোভাবেই তিন বছরের শিক্ষা কোর্সকে মেনে নিতে পারছিল না। বাধ্যতামূলক ইংরেজি নিয়েও ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ ছিল। ডিগ্রি পর্যায়ের ছাত্র এম আই চৌধুরী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং ঢাকা কলেজ থেকে শুরু হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ (তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজ)-এর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও এতে অংশ নেয়। সবাই মিলে 'ডিগ্রি স্টুডেন্ট ফোরাম' নামে একটি ব্যানারে আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরে নাম বদলে ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফোরাম করা হয়। তারও পরে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৫ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রসমাবেশ, যেখানে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। ছাত্রদের এই ভূমিকা দেখে পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একধরনের ভীতির সঞ্চার হয়, যা সরকারের পরবর্তী আচরণে প্রকাশ পায়।

গোটা পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুবের শিক্ষানীতিবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর কেন্দ্রীয়ভাবে আন্দোলন চাঙ্গা হতে থাকে। ১৯৬২ সালের ২৫ জুন আইয়ুব ঘোষিত শাসনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানানো হয়। রাজনৈতিক নেতারাও সারা দেশে সভা-সমাবেশ শুরু করায় জনমনে আশার সঞ্চার হয় এবং বছরের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ১৬ সেপ্টেম্বর ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ যৌথ সভা আহ্বান করে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও রাস্তায় নেমে আসে আর তাদের সঙ্গে পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করে। এতে ৯৫ শতাংশ অন্য পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী হাইকোর্টের কাছে মিছিলের গতিরোধ করে ও গুলি চালায়। এতে বাবুল নামে একজন নিহত হন। বাস কন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা গুলিবিদ্ধ ও নিহত হন। ওয়াজিউল্লাহ নামে একজন গৃহকর্মী গুলিবিদ্ধ হন, হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান। ২৫০ জনের বেশি লোক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হন। এর প্রতিবাদে তিন দিনের শোক পালনের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ২৪ সেপ্টেম্বর ছাত্ররা পল্টনে এক ছাত্র জনসভায় সরকারের প্রতি 'চরমপত্র' ঘোষণা করে। এইপরিস্থিতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তার ফলে শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের কাজ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

আইয়ুবের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এ দেশের ছাত্রসমাজ শুধু শিক্ষার অধিকার নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করেছিল। তারই ফলে আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু আজও কি আমরা সবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছি? উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যেগুলোয় শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা নেই, দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় যদিও মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করছে, সেগুলোয় অর্থনৈতিকভাবে সাধারণের প্রবেশাধিকার একেবারেই সীমিত অর্থাৎ তা ধনিক শ্রেণির জন্যই সম্ভবত খোলা রাখা রয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে যদিও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে, রাষ্ট্র পরিচালিত এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন, তা না হলে এটি একেবারেই বেমানান মনে হচ্ছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু সেই সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষার মান শূন্যের কাছাকাছি। মাধ্যমিক শিক্ষায় বিরাজ করছে বিরাট বৈষম্য। ১৬ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ৩৩৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুরোপুরি রাষ্ট্র পরিচালিত, বাকিগুলো পরিচালিত হচ্ছে কমিউনিটি ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং পুরোপুরি বেসরকারি পর্যায়ে। বেসরকারি শিক্ষকরা এখনো রাজপথে আন্দোলন করছেন তাঁদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে। এ বিষয়গুলোয় সরকার, শিক্ষকসমাজ, রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে হবে। কেবল তখনই ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসের স্বপ্ন সফল হবে।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত
সাবেক ক্যাডেট কলেজ ও রাজউক কলেজ শিক্ষক
masumbillah65@gmail.com

আইয়ুবের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এ দেশের ছাত্রসমাজ শুধু শিক্ষার অধিকার নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করেছিল। তারই ফলে আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু আজও কি আমরা সবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছি? উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যেগুলোয় শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় যদিও মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করছে, সেগুলোয় অর্থনৈতিকভাবে সাধারণের প্রবেশাধিকার একেবারেই সীমিত। অর্থাৎ তা ধনিক শ্রেণির জন্যই সম্ভবত খোলা রাখা রয়েছে